BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03070031

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 07| July 2025| e-ISSN: 2584-1890

রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম : একটি তুলনামূলক আলোচনা

সাহাবুদ্দিন আহমেদ

বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়

Email: saha78692@gmail.com

Abstract:

ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আচার ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য থাকলেও আধুনিক কাল তথা আধুনিক মনের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের চেয়ে বৌদ্ধ আদর্শই অধিকতর উপযোগী। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মাদর্শ থাকা সত্ত্বেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তুলনামূলক বিচারে দেখা যাবে বৌদ্ধধর্মের আদর্শের সাথে বেশ কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের এক গভীর ঐক্য দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের মানবপ্রেমের ধর্মাদর্শের মতোই বৌদ্ধ ধর্মে জ্ঞানকে যেমন উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে তেমনি মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও প্রবল। এইজন্যই দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মে যেখানে মানুষের আত্মশক্তি ও মোহমুক্ত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ। এইজন্যই বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের করুণার বাণী, ত্যাগের আদর্শ ও বিশ্বব্যাপী কল্যাণচিন্তার জয়গানে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ এমন সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

Keywords: *রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব, বুদ্ধ, বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম, ধর্মাদর্শ.*

Introduction:

উনিশ শতকে বাঙালির নবজাগরণের সূচনায় সাহিত্য-সংস্কৃতির উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মচিন্তাজাত দার্শনিক উপলব্ধির সংযোগ ঘটে। বৌদ্ধসাহিত্যের অনুবাদ ও সমালোচনা এই উপলব্ধিকে জাগ্রত রাখে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, কেশবচন্দ্র সেন, অঘোরনাথ গুপ্ত, নবীনচন্দ্র সেন, শরচ্চন্দ্র দেব, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ প্রমুখ মনীষীতুল্য ব্যক্তি বুদ্ধদেবের জীবন ও দর্শন নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেছেন। রবীন্দ্রমানস গঠনে এদের চিন্তাধারা প্রভাব ফেলেছিল। বুদ্ধ সম্পর্কে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গিও তাঁর অজানা ছিল না। হীনযান-মহাযান সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। বুদ্ধদেবকে নিয়ে তাঁর নানামাত্রিক ভাবনা নিয়ে গ্রন্থও রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক আবহেও ছিল বৌদ্ধ দর্শনের চর্চা। তাঁর ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আর্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত' (১৮৯৯) এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'বৌদ্ধধর্ম' (১৯০১) গ্রন্থদু'টিই তার প্রমাণ বহন করে।১৯১৪ সালের ৮ জুলাই ব্রিটিশ কবি রবার্ট সেইমর ব্রিজকে রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

"My religion is my life—it is growing with my growth—it has never been grafted on me from outside."[1]

(আমার ধর্মই আমার জীবন—এটা আমার বয়সের সাথে সাথে বেড়ে উঠছে—বাইরে থেকে কখনোই এটা আমার গায়ে লেখা হয়নি।)

রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ মূলতঃ তিনটি স্বতন্ত্র ধারার মধ্য দিয়ে সমন্বিত হয়েছে- বেঙ্গল রেনেসাঁ, মধ্যযুগীয় সমন্বয়ী বৈষ্ণববাদ ও অনেকটা সূফীবাদ, আর বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের লৌকিক জীবনধারা। অবশ্য এ বাদে পাশ্চাত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদও তাঁকে সাংঘাতিকভাবে আন্দোলিত করে। আর একটি ধর্মচেতনার প্রতি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আকর্ষণ ছিল, তা হল বৌদ্ধধর্ম।

Discussion

আমাদের দেশে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মে একদিকে আচার ও যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান এবং অন্য দিকে দার্শনিক তত্ত্বের প্রাধান্য বেশি। এখানে মানব সম্পর্ক এবং দয়া করুণা প্রেম প্রভৃতি মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি লক্ষ্য অপেক্ষাকৃত কম। আর ত্যাগে প্রেমে কল্যাণে মানুষী মহিমার যা কিছু শ্রেষ্ঠ প্রকাশ তাকেও দৈবী লীলারূপে চিত্রিত করার একটা সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। যেহেতু এখানে মানুষের চেয়ে দেবতা বড়, মর্ত্যলোকের চেয়ে অমর্ত্যলোকের মহিমা অধিকতর স্বীকৃত। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মে মানবসম্পর্ক ও উক্ত হৃদয়বৃত্তিকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এখানে যাগযজ্ঞ ও বাহ্যিক অনুষ্ঠানের কোন সার্থকতা নেই। মানুষের মধ্যে যে উদ্যম, শ্রেয়োবোধ ও কল্যাণশক্তির মহিমা নিহিত রয়েছে, তাকে উদ্বুদ্ধকরাই বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই অনুধাবন করেছেন-

"ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গহইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতে তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন। এমনি করিয়া শ্রদ্ধার দ্বারা, ভক্তির দ্বারা, মানুষের অন্তরের জ্ঞান শক্তি ও উদ্যমকে তিনি মহীয়ান করিয়া তুলিলেন। মানুষ যে দীন দৈবাধীন হীন পদার্থ নহে, তাহা তিনি ঘোষণা করিলেন।"[2]

বাস্তবিক দয়া কল্যাণ প্রভৃতি বৃত্তিসমূহ একান্তভাবে স্বর্গের সামগ্রী নয়, তা মানব মহিমারই শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। বিশেষত বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এর স্পষ্ট প্রমাণ নিহিত রয়েছে। বুদ্ধদেব তাঁর পূর্ব পূর্ব জন্মে বিভিন্ন প্রাণিরূপে জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষত মনুষ্যরূপে তিনি প্রতি জন্মে দান শীল ক্ষান্তি মৈত্রী প্রভৃতি পারমীর একটি না একটি পূর্ণতাসাধন করে মানুষের শ্রেষ্ঠত্বের চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে মানুষের কল্যাণশক্তির অমিত মহিমাই অত্যুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পেয়েছে। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, বৌদ্ধধর্মে মানুষের হৃদয়বৃত্তি বিকাশের প্রতি কতখানি গুরুত্ব দান করা হয়েছে।

জ্ঞানের মর্যাদা ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেই বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এখানেও উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য লক্ষ্য করবার বিষয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে জ্ঞান প্রধানত তত্ত্বমুখী, আর বৌদ্ধধর্মে জ্ঞান প্রধানত প্রেমমুখী। এসকল দিক থেকে বিচার করতে গেলে আধুনিক কাল তথা আধুনিক মনের পক্ষে ব্রাহ্মণ্য আদর্শের চেয়ে বৌদ্ধ আদর্শই অধিকতর উপযোগী। আর রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মানবধর্ম অর্থাৎ মৈত্রীধর্মেরই উপাসক। রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতকে কোন নাম দিতে হলে মানুষের ধর্মই বলতে হবে। কেন না মানুষই এখানে প্রধান লক্ষ্য, যে মানুষের পরিচয় জাতিগত, সম্প্রদায়গত ও ভৌগোলিক সীমানা ডিঙিয়ে ব্যাপ্ত হয়ে

আছে সর্বদেশে ও সর্বকালে। বস্তুত নবযুগের ধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন এর মধ্যে তাঁর আপন ধর্মবোধের একটি সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে-

> "আধুনিক পৃথিবীতে সেই পুরাতন ধর্মের সহিত নূতন বোধের বিরোধ খুবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সে এমন একটি ধর্মকে চাহিতেছে যাহা কোনো একটি বিশেষ জাতির বিশেষ কালের বিশেষ ধর্ম নহে; যাহাকে কতকগুলি বাহ্য পূজাপদ্ধতির দ্বারা বিশেষ রূপের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলা হয় নাই; মানুষের চিত্ত যতদূরই প্রসারিত হউক যে ধর্মকোনো দিকেই তাহাকে বাধা দিবে না, বরঞ্চ সকল দিকেই তাহাকে মহানের দিকে অগ্রসর হইতে আহ্বান করিবে। মানুষের জ্ঞান আজ যে মুক্তির ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে সেইখানকার উপযোগী হৃদয়বোধকে এবং ধর্মকে না পাইলে তাহার জীবনসংগীতের সুর মিলিবে না, এবং কেবলি তাল কাটিতে থাকিবে।"৩

এখানে রবীন্দ্রনাথ এমন এক নবধর্মের আদর্শকে তুলে ধরেছেন যা একদিকে চিরাচরিত প্রথার বন্ধন থেকে মানুষের জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধিকে মুক্ত রাখবে, আবার অন্য দিকে মানুষের হৃদয়কে প্রসারিত করে কল্যাণের প্রেরণা দান করবে। জ্ঞানে প্রেমে ও কর্মে জীবনের এই সমন্বিত রূপের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার প্রধান পরিচয় নিহিত। আর রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের এক গভীর ঐক্য দেখা যায়। এই ধর্মে জ্ঞানকে যেমন উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে তেমনি মৈত্রী-করুণার প্রেরণাও প্রবল। এখানেই বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক যোগসূত্র। এইজন্যই দেখা যায়, বৌদ্ধধর্মে যেখানে মানুষের আত্মশক্তি ও মোহমুক্ত জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, সেখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রধান আকর্ষণ।এইজন্যই বুদ্ধদেব তথা বৌদ্ধধর্মের করুণার বাণী, ত্যাগের আদর্শ ও বিশ্বব্যাপী কল্যাণচিন্তার জয়গানে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ এমন সমুজ্জল হয়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্মের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথকে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণ করেছে এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন-

> "অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা, প্রধানতঃ এই ক'টি নীতিই বৌদ্ধসংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে গভীর যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে। এজন্যই চারিত্রপূজারী রবীন্দ্রনাথ পুণ্যচরিত বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে কিছুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।"৪

বৌদ্ধধর্মের এই চিরন্তন আদর্শগুলি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধার আলোকে প্রকাশ পেয়েছে এবং এর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন।বুদ্ধদেবের নৈতিক আদর্শের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং এই আদর্শকে তিনি শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে তাকেও উপেক্ষা করা যায় না। বুদ্ধদেব যে নীতির কথা বলেছেন এখানেই বৌদ্ধধর্মের শেষ কথা নয়। তা হল উপায় মাত্র। বুদ্ধদেব তাকে বলেছেন 'ভেলা'। সাগর পার হতে গেলে যেমন ভেলার প্রয়োজন তেমনি ভবসাগর থেকে উত্তীর্ণ হতে গেলেও এই নীতি বা মার্গ অনুসরণ করতে হবে। এখানে একমাত্র লক্ষ্য হল পারে যাওয়া। বুদ্ধদেব একেই বলেছেন 'নির্বাণ' বা মুক্তি। এই মুক্তি অবিদ্যা, তৃষ্ণা ও ভববন্ধন থেকে মুক্তি। মানুষের সকল দুঃখের মূলে রয়েছে অবিদ্যা। এর থেকে উৎপন্ন হয় তৃষ্ণা। আবার এই তৃষ্ণার ফলেই মানুষ জন্মান্তরের আবর্তে ঘুরে মরে। পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করা দুঃখজনক। কেননা জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, প্রিয়-বিয়োগ ও অপ্রিয়সংযোগ প্রভৃতি দুঃখে পরিপূর্ণ এই জগৎ। এখানে কোথায় আনন্দ কোথায় সুখ! সেজন্য বুদ্ধদেব তৃষ্ণার মূলোচ্ছেদ করে জন্মান্তরের অনুশাসন মুক্ত হয়ে নির্বাণলাভের কথা বলেছেন। এখানেই বৌদ্ধধর্মের পরম প্রাপ্তি ও চরম লক্ষ্য।

বুদ্ধদেব এখানে যে মুক্তির কথা বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ সে অর্থে মুক্তির কথা বলেন নি। সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়াকেই রবীন্দ্রনাথ মুক্তি মনে করেন না। বরঞ্চ তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে এখানে একটা বিপরীত সুরই ধ্বনিতহয়েছে-

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।

অসংখ্যবন্ধন-মাঝে মহানন্দময়

লভিব মুক্তির স্বাদ।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে বন্ধনের কথা বলেছেন সে বন্ধন আনন্দের বন্ধন, প্রেমের বন্ধন। এই প্রেমের মধ্যেই রয়েছে যথার্থ মুক্তি। কবি জগতের এই প্রেমের বন্ধনকে অস্বীকার করেন না-

> "প্রকৃতি তাহার রূপরস বর্ণগন্ধ লইয়া, মানুষ তাহার বুদ্ধিমন তাহার স্নেহপ্রেম লইয়া, আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে-সেই মোহকে আমি অবিশ্বাস করি না, সেই মোহকে আমি নিন্দা করি না। তাহা আমাকে বন্ধ করিতেছে না, তাহা আমাকে মুক্তই করিতেছে; তাহা আমাকে আমার বাহিরেই ব্যাস্ত করিতেছে।...জগতের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া, প্রিয়জনের মাধুর্যের মধ্য দিয়া ভগবানই আমাদিগকে টানিতেছেন-আর কাহারও টানিবার ক্ষমতাই নাই। পৃথিবীর প্রেমের মধ্য দিয়া সেই ভূমানন্দের পরিচয় পাওয়া, জগতের এই রূপের মধ্যেই সেই অপরূপকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করা, ইহাকেই তো আমি মুক্তির সাধনা বলি। জগতের মধ্যে আমি মুগ্ধ-সেই মোহেই আমার মুক্তিরসের আস্বাদন।"[৬]

জগতের প্রতি মানুষের প্রতি কবির অসীম আকর্ষণ। তাঁর নিকট 'মধুময় পৃথিবীর ধূলি'।তিনি সীমার মধ্যেই অসীমের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করেন। সংসারকে অস্বীকার করে এবং সমস্ত স্নেহবন্ধন ছিন্ন করে একান্ত বিশুদ্ধ-ভাবে অনন্তকে উপলব্ধি করা যায় না। রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা ভাবে এই কথাই ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রকৃতির প্রতিশোধে'র মধ্যেও তিনি এই তত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। সংসার বিমুখতার আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন গ্রহণ করতে পারেন নি।রবীন্দ্রসাহিত্য মর্ত্যপ্রেম ও মানবপ্রেমের বাণীতে পরিপূর্ণ-

"শ্যামলা বিপুলা এ ধরার পানে

চেয়ে দেখি আমি মুগ্ধ নয়ানে;

সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে

ভরে আসে আঁখিজল-

বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,

বহু দিবসের সুখে দুখে আঁকা,

লক্ষ যুগের সংগীতে মাখা

সুন্দর ধরাতল।"[৭]

কবির নিকট এই সংসারের কিছুই তুচ্ছ নয়, স্বর্গের চেয়েও প্রিয় এই পৃথিবী। তাই তো কবি বার বার কান্নাহাসির এই জগতের মধ্যেই ফিরে আসতে চান-

আবার যদি ইচ্ছা কর

আবার আসি ফিরে

দুঃখসুখের-ঢেউ-খেলানো

এই সাগরের তীরে।

আবার জলে ভাসাই ভেলা,

ধূলার 'পরে করি খেলা,

হাসির মায়ামৃগীর পিছে

ভাসি নয়ন-নীরে।

কাঁটার পথে আঁধার রাতে

আবার যাত্রা করি-

আঘাত খেয়ে বাঁচি কিংবা

আঘাত খেয়ে মরি।

আবার তুমি ছদ্মবেশে

আমার সাথে খেলাও হেসে,

নূতন প্রেমে ভালোবাসি

আবার ধরণীরে।” ৮

বুদ্ধদেবের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য এখানে সহজেই ধরা পড়ে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, গীতালি'র অন্তর্গত উদ্‌ধৃত কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধগয়াতে বসেই রচনা করেন। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য অন্য একটি উদাহরণ থেকে আরো স্পষ্ট হবে।--

“কহিল গভীর রাতে সংসারে বিরাগী

‘গৃহ তেয়াগিব আজি ইষ্টদেব লাগি।

কে আমারে ভুলাইয়া রেখেছে এখানে?’

দেবতা কহিলা, ‘আমি’। -শুনিল না কানে।

সুপ্তিমগ্ন শিশুটিরে আঁকড়িয়া বুকে

প্রেয়সী শয্যার প্রান্তে ঘুমাইছে সুখে।

কহিল, 'কে তোরা ওরে মায়ার ছলনা?'

দেবতা কহিলা, 'আমি'। -কেহ শুনিল না।

ডাকিল শয়ন ছাড়ি, 'তুমি কোথা প্রভু?'

দেবতা কহিলা, 'হেথা'। -শুনিল না তবু।

স্বপনে কাঁদিল শিশু, জননীরে টানি-

দেবতা কহিলা, 'ফির'। শুনিল না বাণী।

দেবতা নিশ্বাস ছাড়ি কহিলেন, 'হায়,

আমারে ছাড়িয়া ভক্ত চলিল কোথায়?"৯

'চৈতালি'র অন্তর্গত এই কবিতাটি রাজকুমার সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের একটি প্রধান দিক্ দুঃখসত্য। তাঁর জীবন ও বাণীতে দুঃখের একটি নির্মম কঠোর রূপ অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। জাতক-নিদানে উল্লিখিত হয়েছে, মহাভিনিষ্ক্রমণের প্রাক্কালে রাজকুমার সিদ্ধার্থ জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও প্রব্রজিত পুরুষ-এই চারিনিমিত্ত দর্শন করেন। এর থেকে তিনি জীবনের দুঃখরূপটি প্রথম গভীরভাবে উপলব্ধি করলেন। মানুষের জীবনে জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখ অনিবার্যরূপেই আসে। এই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভের উপায় উদ্‌ভাবনের জন্যই তিনি সংসার ত্যাগ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বুদ্ধত্বলাভের পর সারনাথের ইসিপতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের নিকট সর্বপ্রথম তিনি যে নবলব্ধ সত্যধর্ম বিবৃত করেছেন তা'ও দুঃখকে কেন্দ্র করে। দুঃখ আছে, দুঃখের হেতু আছে, দুঃখের নিরোধ আছে এবং দুঃখ নিরোধের উপায় আছে-এই চারি আর্যসত্য বৌদ্ধদর্শনের গোড়ার কথা। এর থেকে বুঝতে পারা যায়, দুঃখসত্য বৌদ্ধদর্শনে কতখানি প্রাধান্য লাভ করেছে। মানুষের জীবনে সীমাহীন দুঃখের সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলেছেন-

> "চিরকাল তোমরা... মাতা-পিতা-পুত্র-কন্যার মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করেছ। রোগের ভোগের বিপত্তি সহ্য করেছ, প্রিয়-বিয়োগ অপ্রিয়-সংযোগ হেতু রোদন করেছ। কুন্দন করতে করতে তোমরা যত অশ্রু বিসর্জন করেছ তা চারি মহাসমুদ্রের জল থেকেও বেশি।"১০

সমস্ত জগৎ জুড়ে রয়েছে এক অনির্বাণ জ্বালা। এখানে দুঃখের আগুনে সবাই জ্বলেপুড়ে মরছে। তাই বুদ্ধদেব মানুষের প্রতি বার বার এ কথাই বলতে চেয়েছেন- "কো নু হাসো কিমানন্দো নিচ্চং পঞ্জলিতে সতি।"১১

অর্থাৎ, এখানে জ্বলেপুড়ে মরে তোমার কিসের হাস্য, কিসের আনন্দ?এমনি ভাবেই বুদ্ধদেব মানবজীবনে দুঃখের নির্মম ভয়াবহ রূপটিকে তুলে ধরেছেন।

বুদ্ধদেব মানুষের জীবনে দুঃখকে যেভাবে একান্ত করে দেখেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেভাবে দেখেন নি। জগতে যে দুঃখ আছে রবীন্দ্রনাথ সে কথা অস্বীকার করেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই দুঃখ সুখের বিপরীত হলেও আনন্দের বিপরীত নয়, বরং আনন্দের পরিপূরক। সেজন্য দেখা যায়, মানুষ অনেক সময় সানন্দে দুঃখের মহিমাকে বরণ করে নেয়। বুদ্ধদেবের মত

রবীন্দ্রনাথ জীবনকে দুঃখময় বলেন নি। কবির নিকট এই জগৎ আনন্দময়।আর এক পরম আনন্দময়ের প্রসন্নজ্যোতিতে সমগ্র জগৎ প্লাবিত-

প্রেমে প্রাণে গানে গন্ধে আলোকে পুলকে

প্লাবিত করিয়া নিখিল দ্যুলোকে ভূলোকে

তোমার অমল অমৃত পড়িছে ঝরিয়া।

দিকে দিকে আজি টুটিয়া সকল বন্ধ

মুরতি ধরিয়া জাগিয়া উঠে আনন্দ,

জীবন উঠিল নিবিড় সুধায় ভরিয়া।

চেতনা আমার কল্যাণরসসরসে

শতদলসম ফুটিল পরম হরষে

সব মধু তার চরণে তোমার ধরিয়া।”[১২]

রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনসাধনার মূলে রয়েছে ‘আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি চ’ -উপনিষদের এই বাণী।[১৩] এ কথা কবির নিজের উক্তি থেকেও প্রমাণ হবে-

> “উপনিষৎ বলছেন, আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন-যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্তন। বিশ্বজগতে এই-যে আনন্দসমুদ্রে কেবলই তরঙ্গলীলা চলছে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে, সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠেছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ। তার পরে কর্মের বেগে সে যতদূর পর্যন্তই উচ্ছিত হয়ে উঠুক-না এই অনুভূতিটিই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দসমুদ্রেই তার লীলা চলছে। তার পরে কর্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দসমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্ছে যথার্থ জীবন। এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল। সে মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবংসৌন্দর্য প্রকাশ পায়।”[১৪]

রবীন্দ্রনাথ এখানে যে আনন্দের কথা বলেছেন তার সঙ্গে বুদ্ধদেবের জীবনদর্শনের কোন মিল খুজে পাওয়া যায় না। এখানে যেন বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ দুই ভিন্ন জগতের অধিবাসী। একজন জগতের অসীম দুঃখ জালা থেকে মুক্তির জন্য আকুল, আরেকজন জগতের আনন্দরসে মগ্ন। আর জগতের সমগ্র ব্যাপারেরমূলে মঙ্গলময় আনন্দময় এক পরমপুরুষের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আজীবন অবিচলিত বিশ্বাসের পরিচয় তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব একেবারেই নীরব। পরমার্থবিষয়ক কোন আলোচনাকে বুদ্ধদেব অবান্তর ও অনর্থকর বলেই অভিহিত করেছেন।

বুদ্ধদেব মুক্তিকামী সাধক। আর রবীন্দ্রনাথের প্রধান পরিচয় হল তিনি কবি। এখানেই বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শের মূল পার্থক্য নিহিত। আপাতদৃষ্টিতে সংসারের যা কিছু আমাদের নিকট মনোরম ও আকর্ষণীয়, মানুষের যে স্নেহপ্রেম

আমাদের মুগ্ধ করে, বুদ্ধদেবের দৃষ্টিতে এসকল তৃষ্ণার বন্ধনরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। এই তৃষ্ণাই মানুষের সকল দুঃখের মূল। সেজন্য তৃষ্ণার মূলোৎপাটনেই বুদ্ধদেবের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সাধক নন, তিনি কবি। এই বসুধার দৃশ্যে গন্ধে গানে যে আনন্দের প্রকাশ তা-ই কবির বীণাতন্ত্রীতে ঝংকার তোলে। তা না হলে তিনি কবি হতেন কি করে? তিনি বলেন-

> "একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র।...শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপ ক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণরতে প্রবর্তিত করেন, তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের আসনের কাছে আমার আসন পড়ে নি। কিন্তু সেই এক শুভ্র জ্যোতি যখন বহু বিচিত্র হন, তখন তিনি নানা বর্ণের আলোকরশ্মিতে আপনাকে বিচ্ছুরিত করেন, বিশ্বকে রঞ্জিত করেন, আমি সেই বিচিত্রের দূত।...তাঁর রঙ্গশালার বিচিত্র রূপক-গুলিকে সাজিয়ে তোলবার ভার পড়েছে আমার উপর, এইই আমার একমাত্র পরিচয়।"[১৫]

আর বুদ্ধদেব যাকে বন্ধন বলেছেন, রবীন্দ্রনাথ মানুষের সেই স্নেহপ্রেমেই মুগ্ধ। এই প্রেমের মধ্যেই তিনি পেয়েছেন মুক্তির স্বাদ, অসীমের পুণ্যস্পর্শ। জগতের লীলানিকেতনে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন প্রেম ও প্রীতির অর্ঘ্যই দিয়ে এসেছেন। এখানেই তাঁর সার্থকতা। কবি এর বেশি আর কি-ই বা দিতে পারেন-

> "ধরণীর তলে, গগনের গায়,
>
> সাগরের জলে, অরণ্য-ছায়
>
> আরেকটুখানি নবীন আভায়
>
> রঙিন করিয়া দিব।
>
> সংসার মাঝে দু-একটি সুর
>
> রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
>
> দু-একটি কাঁটা করি দিব দূর-
>
> তার পরে ছুটি নিব।"[১৬]

Conclusion:

বুদ্ধদেব ও রবীন্দ্রনাথ জগতের কাছে তাঁদের সমস্ত জীবনের অভিব্যক্ত সত্যকেই রেখে গেছেন। বুদ্ধদেব মানুষকে দিলেন মুক্তিপথের সন্ধান। তাই মানুষের পূজার বেদীতে তিনি চিরদিন অম্লান মহিমায় বিরাজমান। আর রবীন্দ্রনাথ মানুষকে যে প্রেমগীতিহার উপহার দিয়েছেন, তার বিনিময়ে পেলেন মানুষের হৃদয়ে স্থান। এখানেই তাঁদের সত্য পরিচয়।রবীন্দ্রনাথের বৌদ্ধধর্ম আলোচনা মূলত কোন তত্ত্বালোচনা নয়। সেজন্য দেখা যায় চারি আর্যসত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধধর্মের মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি তিনি আলোচনা করেন নি। পক্ষান্তরে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ কতকগুলি আদর্শের উপর তিনি সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আর একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারা যায়, এই আদর্শগুলি রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যেও প্রবল ছিল।

Reference:

১. Banerjee, Argha Kr. (2018). Tagore on Religion–I, The Statesman editorial feature, 16 November

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৫৭)। প্রবন্ধ- মন্দির, বিচিত্র প্রবন্ধ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ৯৩-৯৪

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫১)। প্রবন্ধ- ধর্মের নবযুগ, সঞ্চয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮ তম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা- ৩৫০

৪. সেন, প্রবোধচন্দ্র। (১৯৬২)। ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ৬৬

৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৯৬)। নৈবেদ্য-৩০, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ৩৭

৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫২)। আত্মপরিচয়-১, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ২২

৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৮৪)। পুরস্কার, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ১৭২

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫৩)। গীতালি-৮৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ১০৪

৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯৪৭)। বৈরাগ্য, চৈতালি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ২৬

১০. ব্রহ্মচারী, শীলানন্দ। (১৪০০)। সংযুক্ত নিকায় -১৪, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

১১. মিত্র, সতীশচন্দ্র। (১৯০৫)। ধম্মপদ-১৪৬, দি স্টুডেন্ট লাইব্রেরী

১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৬৩)। গীতাঞ্জলি-৬, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ৭

১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৬৮)। প্রবন্ধ- কর্ম, শান্তিনিকেতন, ১ম খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ১৩০

১৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৭০)। প্রবন্ধ- চিরনবীনতা, শান্তিনিকেতন, ২য় খন্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ২৮

১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৫২)। আত্মপরিচয়-৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, পৃষ্ঠা- ৮০-৮১

১৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৩৮৪)। পুরস্কার, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, পৃষ্ঠা- ১৭৪

Citation: **আহমেদ. সা.,** (2025) "রবীন্দ্রনাথের ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধধর্ম : একটি তুলনামূলক আলোচনা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-07, July-2025.